কে :অর্থনৈতিক ঘাতক

অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতি!

এই অধ্যায়ে আমেরিকা আপাতত আউট। আমরা অর্থনীতি এবং অর্থনীতির সাথে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক বোঝার চেস্টা করি। এতে ডঃ কুদ্দুস খানের উত্তরও দেওয়া হবে। তিন ভাবে আমরা বোঝার চেস্টা করবঃ

- প্রথমে আসব ডঃ কুদ্দুস খানের বক্তব্যে- যে অর্থনীতির দর্শনই পূর্ণাজ্ঞা দর্শন। এর থেকেই সমাজ বিজ্ঞান, আইন, মনোবিজ্ঞান এবং রাস্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যায় আর কোন সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। এই নিয়ে ইফোরামের মধ্যে বাদ-বিতন্ডা!

অর্থনীতি দিয়ে যাবতীয় সমাজবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করার তত্ত্বটি নতুন এবং এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের (অর্থাৎ অর্থনীতিই বিশুদ্ধ সমাজবিজ্ঞান এবং বাকী সবকিছু ফলিত অর্থনীতি বিজ্ঞান) জনক হলেন স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড লেজার (1999,Edward P Lazear: Economic Imperialism)। ডঃ খান অবশ্য লেজারের নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু উনি যা বলে চলেছেন তা আসলে লেজারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। ইকনমিক্সের গবেষনার বাজারে এটি বেশ চলছে, যদিও সমাজ এবং মনবিজ্ঞানীরা এটিকে আস্তাকুঁরে ফেলে দিয়েছেন। লেজারের নিজেও অর্থনীতি দিয়ে প্রেম এবং সন্তানপ্রেম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাত তুলে দিয়েছেন!! এটা বিবর্তন দিয়ে ব্যাখ্যা করাই ভালো টাইপের বক্তব্য দিয়ে কেটে পরেছেন।

লেজারের বক্তব্য অনুযায়ী অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে একটি মানুষ তার সমস্ত যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে তার সম্পতি বৃদ্ধির শ্রেষ্ট চেস্টা করবেন। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত উক্ত গবেষনা পত্রে লেজার দেখান যে, রাজনীতি, বিবাহ, প্রেম, ডিভোর্স, আইন, যুদ্ধ, ধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুর মূলেই মানুষের এই যুক্তি-নিজের সম্পদের যুক্তিবাদী শ্রেষ্ট সম্ভাব্য প্রসারন! এতএব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ পন নেবে, সেটাই স্বাভাবিক!

সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যায় লেজার দুটি গবেষনার উল্লেখ করেছেন। শেলিং (1960:Strategy of Conflict) এবং বুচানন (1962:Calculus of Consent)। শেলিং গেমতত্বের অনেক অঙ্ক করে দেখিয়েছেন যে

‘বাহুবল প্রদর্শন এবং বাহুবলের উত্তর, সামরিক অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থানের দমন, যুদ্ধ , অস্ত্রপ্রতিযোগিতা–এসবই গরম বা ঠান্ডা মাথার কাজ ভেবে চালানো যায়––––এ সবের পেছনে যদি অর্থনৈতিক যুক্তি আছে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এই ঘটনা গুলির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা মেলে।‘

শেলিং তার গবেষনায় ফরাসীবিপ্লব, হিটলারের উত্থান-ইত্যাদি নানান ঘটনার গনিতিক (?) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিওক্লিয়ার স্টাটেজিক যুদ্ধে শেলিং এর তত্ত্ব বেশ সন্তোষজনক। উনি বলছেন রাশেলের শক্তি বা ফ্রেয়েডের লিঙ্গ দিয়ে নিউক্লিয়ার ডিটারেন্টের ব্যাখ্যা হয় না। এই যে কার্গিলে ভারত-পাক যুদ্ধ থামানো গেল, এর পিছনে পুরো কারণটাই অর্থনৈতিক।

সমাজবিজ্ঞানীরা একে অবশ্য কাকতলীয় বলছেন-উনাদের বক্তব্য অর্থনীতি দিয়ে রাস্টের জন্মই ব্যাখ্যা করা যায় না, তো রাস্ট্রবিজ্ঞানের আর কি ব্যাখ্যা হবে!

(বিবাহ এবং বিচ্ছেদের ব্যাপারে লেজারের তত্ত্বটি বেশ ইন্টারেস্টিং। উনার মতে বিবাহে, নারী পুরুষ আসলে কর্মী, পরিবার আসলে সংস্থা। স ন্তান সন্ততি এবং তাদের উন্নত মানের সম্পদে পরিনত করা হচ্ছে উৎপাদনশীলতা। বিবাহ বিচ্ছেদের মূল কারণ , সন্তানের প্রতি কোন একজনের অবহেলা।
পরকীয়া প্রেম তাহলে ডিভোর্সের মূল কারণ না? ৯৫% আমেরিকান নারী পুরুষের অবৈধ প্রেম আছে, কিন্ত সেই প্রেম, যতক্ষন না সন্তানের প্রতি অবহেলায় পরিনত না হচ্ছে, বিচ্ছেদ সাধারণ ত হয় না !!)

- লেজারের বক্তব্য সমাজ বিজ্ঞানীরা মেনে নেন নি, বরং নস্যাৎ করে দিয়েছেন। সামাজিক গতিবিজ্ঞানে, সাম্রাজ্যবাদ ইদানিং বোঝার চেস্টা করা হয়, সামাজিক ক্ষেত্রত্বত্ত দিয়ে। অক্সফোর্ডের জীব-স ংখ্যাতাত্বি বিজ্ঞানী কফম্যান (1993,S.Kauffman, Origin of order, self organization and selection in evolution. Oxford University press) এই ত্বত্তের প্রবক্তা। পরবর্তী কালে উল্লেখ যোগ্য কাজ করেছেন MIT র ডুরল্যাফ এবং ইয়াং (2001, Social Dynamics), বাওলস (2002, Economic Institution and behavior, an evolutionary approach to micro-economics) এবং এগারভ (2002, An Agglomeration Model).

ইনাদের মতে শুধু দ্বান্দিক বস্তুবাদ বা অর্থনীতি বা মনোবিজ্ঞান বা রাজনীতি দিয়ে সমাজিক গতিবিজ্ঞান বোঝার চেস্টা করা আসলে নিউটনীয় গতিসূত্রদিয়ে পদার্থের ধর্ম বোঝার চেস্টা করা -যা সম্ভব নয়। কারণ পদার্থের মধ্যে আছে কোটি কোটি অনু-তাদের মধ্যে কি আকর্ষন বিকর্ষন, তা নিউটন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় বটে, কিন্তু তাদের সামগ্রিক ধর্ম –যেমন তারা কৃস্টাল হবে না তরল হবে, তা বোঝার জন্য পদার্থ বিদ্যায় সংখ্যাতাত্বিক গতিবিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সংখ্যাতাত্ত্বিক গতিবিজ্ঞানের একটি মূল ধারণা হচ্ছে, একটি অনু কি ভাবে ঘুরে বেড়াবে তা নির্ভরশীল বাকী অনুরা তার উপর গড় যে আকর্ষন বিকর্ষন বল দিচ্ছে তার উপর। অর্থাৎ, একটি মানুষের সমাজিক গতিবিধি সেই সমাজের বাকী মানুষেরা তার সাথে কি কি ভাবে মেলা মেশা করছে -এটা অর্থনৈতিকও হতে পারে, মনস্তত্ত্বও হতে পারে। যেমন ব্যাপারীর সাথে সম্পর্ক ব্যবসার-প্রেমিকার সাথে প্রেমের!

এটি লেজারের মূল উপপাদ্য বিরোধী। কারণ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি হল, একটি মানুষ, যুক্তিযুক্ত ভাবে তার ধন সম্পতি বাড়ানোর চেস্টা করবে। মানুষের এই যৌক্তিক ব্যবহার, যার উদ্দেশ্য নিজের ধন সম্পদ বাড়ানো, ক্ষেত্র ত্বত্তের সাথে মেলে না। কারণ ক্ষেত্র ত্বত্ত বলছে, মানুষের ব্যবহার তার সমাজ তাকে কি ভাবে চালাচ্ছে তার উপর নির্ভরশীল। তার ব্যক্তিগত যৌক্তিকতা আসলে অনেকগুলি সামাজিক বলের প্রতিফলন- যা বুঝতে মনোবিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিকবিজ্ঞানের প্রয়োজন। শুধু অর্থনীতি বা দ্বান্দিক বস্তুবাদ যে সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম, কফম্যান সেটি দেখান ১৯৯৩ সালে [S.Kauffman, Origin of order, self organization and selection in evolution. Oxford University press, p709,1993]. এর মূল কারণ হিসাবে কফম্যান দেখিয়েছিলেন, সামাজিক বিন্যাসের ফলে এই যে নানান নতুন রাস্ট্র তৈরী হচ্ছে, এটা সব সময় হয় সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা সৃস্টির প্রয়াসে- অনেকটা তরল পদার্থের বিসৃঙ্খল অনুরা যেমন ভাবে কঠিনে পরিনত হলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলার জন্ম হয়। কফম্যান এটাও দেখাচ্ছেন, নতুন রাস্ট্রসৃষ্টি আসলে অর্থনৈতিক মূল উপপাদ্য বিরোধী-কারণ পুরানো রাস্ট্র ভেঙে নতুন রাস্ট্র তৈরী হলে, বাজার সংকুচিত হয়। অর্থাৎ মানুষের সম্পতি বৃদ্ধির উপায় কমে যায়।

ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্থানে ভেঙে যাওয়া কোন অর্থনৈতিক যুক্তি সমর্থনে হবে? একটা দেশ দুটুকরো হওয়া মানে তো বাজার ছোট হওয়া। আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা কথাই ভাবুন। সেখানেও একই প্রশ্ন উঠবে।

লেজারের বক্তব্য ঠিক হলে এমনটা হওয়া উচিত না।কারণ তার বক্তব্য, সমাজবিজ্ঞানের সবকিছুই মানুষের সম্পতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এই জন্য লেজারের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ সমাজবিজ্ঞানীরা মেনে নেন নি।

সামাজিক ক্ষেত্রত্বত্ত অনুযায়ী, পদার্থের যেমন তিনটি অবস্থা- সমাজেরও তিন অবস্থা। শৃঙ্খল (যেমন চীন, আমেরিকা। যেখানে আইনের নিয়ম ভালো চলে), বিশৃঙ্খল (যেমন রাওন্ডা, সোমালিয়া, চেচেনিয়া, কাশ্মীর) এবং জটিল (যেমন ভারত, বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার অবস্থা-যেখানে আইন থেকেও নেই। আবার একটি সরকারও আছে। কিন্তু দেশের ভবিষ্যত অনেকগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক নৃতাত্বিক এবং রাজনৈতিক বলদের ক্রীয়া প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল)।

ক্ষেত্রতত্বের ব্যাখ্যার সব চেয়ে বড় সফলতা হল, ইউরোপে রাস্ট্রের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করা (2002, Yogorov : Social Dynamics and Emergence of Order. Building theory of field in the economics)। ক্ষেত্রতত্ত্বের বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, অর্থনীতি, বা দ্বান্দিক বস্তুবাদ বা শুধু একটি বলের উপর ভিত্তি করে ইউরোপের রাস্ট্র বিন্যাসের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

১৪০০ সালে ইউরোপের জনসংখ্যা ছিল প্রায় আট কোটি-প্রায় ৫০০ টি স্বাধীন রাস্ট্র ছিল। ১৯৯০ সালে মোটে ৩০ টি রাস্ট্র পড়ে আছে, সমগ্র জন সংখ্যা ৫০ কোটি। ক্ষেত্রত্বত্ত দিয়ে কফম্যান দেখান যে, কৃস্টালের বৃদ্ধির সময় যেমন প্রথমে ছোট ছোট কৃস্টালের জন্ম হয় (পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন জল থেকে বরফ হওয়ার আগে ছোট ছোট বরফের স্তর জলের উপর ভাসে) এবং সেই কৃস্টাল গুলি বাকী অনু বা আরো ছোট ছোট কৃস্টালদের আকর্ষন করে বৃহৎ কৃস্টাল গঠন করে- ইউরোপীয়ান রাস্ট্র সমূহ সেই ভাবেই তৈরী হয়েছে। কফম্যান দেখিয়েছিলেন রাস্ট্রর সীমানা যত বৃদ্ধি পায়, তার সামরিক বল বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তারা প্রতিবেশী রাস্ট্রগুলিকে গ্রাস করার চেস্টা করে। কিন্তু জাতিগত বৈষম্য, এই কৃস্টাল বা রাস্ট্রকে ভেঙে ফেলার চেস্টা করে। সেই জন্য, ইউরোপে স্কুলে বাচ্চাদের মাথায় জাতীয়তাবাদ দিয়ে ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছে ১৮০০ সাল থেকে।

কিন্তু রাস্ট্র যদি উপনিবেশের সংখ্যা বাড়াতে থাকে তাহলে কি হবে? একেকটি উপনিবেশের একেকটি ভাষা, জাতি এবং ধর্ম। তারাতো বিদ্রোহ করবে-মানে বৃহৎ কৃস্টাল থেকে বেরোতে চাইবে? এতএব, টেলর এবং ফ্লিন্ট (2000, Political Economy-Nation and Geography) একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্রীয়ার ব্যাখ্যা করেন-একে বলে- কন্ড্রাটেইফ চক্র। যেখানে বলা হয় উপনিবেশের সংখ্যা একবার বারবে—তারপরে জাতিগত বিদ্রোহে আবার কমে যাবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আবার বৃদ্ধি পাবে। ভারতের দিকে তাকান, একই ব্যাপার । মৌর্য্য সাম্রাজ্য তৈরী হয়েছে ভেঙে গেছে। মুঘল সাম্রজ্য এসেছে, চলে গেছে। রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীয় এবং বিকেন্দ্রীকরন বৃত্তাকারে আমরা লক্ষ্য করে চলেছি। হেগেলের দ্বান্দিক বস্তুবাদ মানলে, উপনিবেশবাদের এই বৃত্তের গুনগত ব্যাখ্যা করা যায় বটে কিন্তু তার ভবিষ্যতবানী করা যায় না বা এর কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক মডেল দেওয়া যায় না।

এছারা, রাজনৈতিক সাম্য সুস্থির না অস্থির সাম্য, তারো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দ্বান্দিক বস্তুবাদে মেলে না।

সামাজিকক্ষেত্র তত্ত্বে যা বলা হচ্ছে তা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এটি গনিতিক মডেল-যা দিয়ে নানান রাস্ট্রনৈতিক ঘটনার কম্পুটার সিমুলেশন করা যায়!

- **মার্ক্সীয় বিশ্লেষনঃ** আপাতত সামাজিক ক্ষেত্রতত্ত্ব রেড হট-সাম্রাজ্যবাদ এত জটিল একটি প্রক্রিয়া যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষনাগারে মার্ক্সের হালে পানি নেই।

এমনিতেও মার্ক্স (1847, Protectionism, Free Trade and Working Class)এবং এঙ্গেলস (1847, On the question of Free Trade)অবাধ মুক্ত বানিজ্যকে পুঁজিবাদ তথা সমাজবিকাশের সহায় বলেই মনে করতেন। এঙ্গেলসতো আবার আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যশুল্ককে স্ক্রু টাইট করার সাথে তুলনা করেছেন (1847:Protective Tarrif or Free Trade System?)। সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে মার্ক্স

এঙ্গেলসের চিন্তাধারা নিজেদের মধ্যের চিঠিপত্রের মধ্যেই সীমিত। ভারতের উপর মার্ক্সের লেখা থেকে, সাম্রাজ্যবাদ সম্মন্ধে তার চিন্তার কিছু রূপরেখা পাওয়া যায় (1853: The future result of British rule in India, 1953:British rule in India)।

মার্ক্সীয় চিন্তাভাবনায় সাম্রাজ্যবাদের উপর অধিকাংশ কাজই লেনিনের। লেলিনের বক্তব্য অনুযায়ী উপনিবেশ বিস্তার আপাতত শেষ-এবার পুঁজিতন্ত্রের আসল বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু। উন্নতদেশ গুলিতে জমা হওয়া পুঁজি, বিদেশী পুঁজিতে পরিনত হবে এবং এটাই পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ রূপ (Lenin, *Imperialism the Highest Stage of Capitalism,* LCW Volume 22, p. 266-7.] । আমি লেলিনের উপর বিশ্লেষনে গেলাম না, কারণ তার তত্ত্বের অধিকাংশই আর প্রাসঙ্গিক নয়।

এবার ডঃ খানের প্রথম চ্যালেঞ্জটা নেওয়া যাক। অর্থনীতি দিয়ে রাস্ট্রনীতি বোঝা যায় কিনা?

সামাজিক ক্ষেত্রতত্ত্বদিয়ে আমি পরিস্কার দেখিয়ে দিয়েছি, রাস্টের জন্মই অর্থনীতি ব্যাখ্যা করতে পারে না, রাস্ট্রবিজ্ঞান অনেক দূরের ব্যাপার।

এবার আসি ডঃ খানের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জে। আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বকে এতো এতো ডলার দিচ্ছে, এটা মানবিকতা নয়?

প্রথমেই বলে নি, মুক্ত বাণিজ্যের সাথে ডলার সাহায্যকে গুলিয়ে ফেলবেন না প্লীজ। ভারতীয় সফটওয়ার বুম মুক্ত বাণিজ্যের ফসল যা মার্ক্স এবং লেজারের তত্ত্বকেই সমর্থন করে।

আমেরিকার এই অর্থনৈতিক সাহায্য আসলে কি?

- প্রথমত X সাহায্য, আমেরিকার বিনিয়োগ।ব্যবসা। তাতে আমার আপত্তি নাই।
- আমেরিকার কিছু কুখ্যাত বহুজাতিক এর থেকে 2X ফয়দা তোলে। এতেও আমার আপত্তি নেই, যতক্ষননা সাহায্য প্রাপ্ত দেশটি উপকৃত হচ্ছে।
- বিনিয়োগের ৭০% যায়, সাহায্যপ্রাপ্ত দেশটির ক্ষমতাবান লোকের হাতে। এই কোরাপশন আমেরিকা দেখেও দেখে না, মদত দেয়। কেন? যাতে ওই দেশের রাজনৈতিক নেতৃবিন্দ আমেরিকার তাবেদার হয়ে থাকে-রাস্ট্রপুঞ্জে ভোট কেনা যায়।
- নীটফল পৃথিবীর অনেক দেশের অর্থনীতি গুঁড়িয়ে গেছে! মানছি দক্ষিন কোরিয়া বা জার্মানী আমেরিকান সাহায্য নিয়েই উন্নত হয়েছে, আমি ল্যাটিন আমেরিকার আরো দশটি দেশ দেখাতে পারি যাদের অর্থনীতি আমেরিকার 'সাহায্যের' চাপে দমবন্ধ হওয়ার যোগাড়।

এই নিয়েই হবে আমার পরের অধ্যায়-অর্থনৈতিক ঘাতক। অর্থাৎ সাহায্যর নামে কি ভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে শুইয়ে দেওয়া হয়।

[চলবে]